

Rs. 2.00

মূল্য : ২ টকা

PRABINBARTA

প্রবীণবর্তা

MONTHLY

মাসিক

Vol : IX Issue : X, 15th, January, 2021 পৌষ, ১৪২৭, বার্ষিক মূল্য-২০ টকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

ইংরাজি নববর্ষে সবাই স্বাগত। এই শতাব্দীর সবচেয়ে খারাপ বর্ষটাকে বোধহয় অতিক্রম করা গেছে। নানান দেশে করোনার টিকাকরণ শুরু হয়েছে। আমাদের দেশেও সেই শুভক্ষণ আগত প্রায়।

কিন্তু এই সুখাবেশ আমাদের অন্নদাতাদের জন্য নয়। দিল্লির তীব্র ঠাণ্ডা, অকালবর্ষণের মধ্যে চাষীদের অবস্থানকাল চল্লিশ দিন অতিক্রান্ত। তবু শাহেনশা দিল্লিশ্বরের ক্রক্ষেপ নাই। তিনি ব্যস্ত রাজধানীর সৌন্দর্যায়নে। সারা দেশ জুড়েই আরো তীব্র গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলা উচিত।

বয়স্ক মানুষের সংগঠন হিসাবে যে দাবীগুলো আমরা দীর্ঘকাল ধরে করে আসছি, তাদের অন্ত্যম—সর্বজনীন পেনসন এবং বয়স্কদের জন্য চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা। স্বাধীন ভারতের কোনো সরকারই এই বিষয়ে যথোচিত গুরুত্ব দেয় নি। আনন্দের কথা, ভারতে এই প্রথম প্রবীণদের নিয়ে সরকারের তরফে সমীক্ষা হয়েছে। প্রসঙ্গত সংখ্যার হিসাবে এটা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সমীক্ষা। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক গত ৩ জানুয়ারি ২০২১, Longitudinal Aging Study in India (LASI) নামক সমীক্ষাটি প্রকাশ করেছে। এর ফলাফল আমাদের উপরোক্ত দাবীগুলোর যথার্থ্যতাই প্রমাণ

করে। সমীক্ষার কয়েকটি তথ্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন—

১) ষাটোর্ধ নাগরিকদের শতকরা ৭৮ শতাংশের কোনো পেনসন নেই।

২) ২৭% প্রবীণ 'Multi-Morbidity' -এর শিকার, যার মধ্যে—

ক) ৪৫% বয়স্ক এক বা একাধিক রোগাক্রান্ত।

খ) ২৭% বয়স্কের মানসিক স্বাস্থ্য ভালো নয়।

৩) তিন চতুর্থাংশ ষাটোর্ধ নাগরিক রক্তচাপ/হাটের অসুখ/ডায়াবেটিস/লাঙ্গের অসুখ বা ক্যানসারের রোগী।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন আরো জানিয়েছেন যে ২০১১-এর আদমশুমারি অনুযায়ী ভারতের মোট জনসংখ্যার ৮.৫% ষাটোর্ধ। বয়স্ক নাগরিকদের সংখ্যা ২০৫০ সালে, গড়ে ৫% বাৎসরিক বৃদ্ধি ধরে, ৩১৯ মিলিয়ন হবে।

আমরা আশা করব, সমীক্ষার ফলাফল দেখে কেন্দ্রীয় সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অন্তত নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে তারা করতে বাধ্য হবেন, কারণ আমরা ক্রমবর্ধমান।

শেষ করার আগে ১৫৮তম জন্মবর্ষে স্মরণ করি স্বামী বিবেকানন্দকে, যাঁকে নিয়ে রাজনৈতিক নেতারা উৎসবে মেতে ওঠেন কিন্তু তাঁর চিন্তাকে বেমালুম ভুলে থাকেন।

মনের বার্ষিক্য

মৃগেন গীতহিত

দেহের মতন মনেও বার্ষিক্য আসতে পারে।

বার্ষিক্য কোষকলার স্থিতি স্থাপকতা (elasticity) অর্থাৎ প্রসারণ আবার সংকোচনের নমনীয়তা কমে যায়। নমনীয়তা থাকলে কোন জিনিস প্রসারিত হতে পারে, আবার সংকুচিত হতে পারে। এটাই সজীবতার লক্ষণ। গাছের একটা ডালকে সহজে বাঁকানো যায়, ছেড়ে দিলে আবার সোজা হয়ে যায়। কিন্তু একটা মরা ডালকে বাঁকাতে গেলেই ভেঙ্গে যাবে। নমনীয়তা কমে গেলে প্রসারণের ক্ষমতা চলে যায়। এই প্রসারণ ক্ষমতা কমে যায় বলেই বৃদ্ধ বয়সে রক্তনালীগুলো রক্তের চাপ নিতে পারে না। তখন একটু বেশি রক্তচাপেই রক্তনালীর দেওয়াল ছিঁড়ে যায়, দেহের ভিতরে রক্তক্ষরণ হয়। তাই প্রসারণ ক্ষমতার গুরুত্ব অনেক। মনের প্রসারণ ক্ষমতারও একই রকমের গুরুত্ব। মনের বার্ষিক্য এলে নিজের এবং পরিপার্শ্বের খুব সমস্যা হয়।

মনের প্রসারণ ক্ষমতা কমে গেলে মানুষ অপরের কথা সহজে গ্রহণ করতে পারে না। সামান্য বিষয়েও অনেক বেশি প্রতিক্রিয়া দেখায়, যার ফলে সমস্যা শুরু হয়। চলিত কথায় আমরা বলি মানুষটা খিটখিটে হয়ে গেছে। প্রসারণ ক্ষমতার অভাব ঘটে উপযুক্ত পরিচর্যার অভাবে। মনের এই পরিচর্যার সমস্যা যে কোনো বয়সে হতে পারে। সাধারণত বেশি বয়সে মানুষকে আমরা খিটখিটে হতে দেখি কারণ দীর্ঘ দিন ধরে ভুল প্রক্রিয়ার ফলে মনের প্রসারণ ক্ষমতা অনেক কমে যায়। মনের প্রসারণ ক্ষমতা কমে গেলে নেতিবাচক মনোভাব গড়ে ওঠে, কোনো কিছুকেই সহজভাবে গ্রহণ

করতে পারে না।

কোনো কিছু প্রসারিত হলে তার ধারণক্ষমতা বেড়ে যায়। যেমন নদীর গভীরতা বাড়লে অর্থাৎ প্রসারিত হলে তা অনেক বেশি জল ধারণ করতে পারে। গভীরতা কম থাকলে সহজেই জল উঠে পড়ে, জনপদের ক্ষতি করে। তেমনি মনের গভীরতা কমে গেলে মনের অভ্যন্তরীণ ধারণ ক্ষমতা কমে যায়, তখন অপছন্দের কোনো ভাবকে মন ধরে রাখতে পারে না, চট করে উগরে দেয়। অন্যের উপর তার প্রভাব পড়ে। সামগ্রিক পরিবেশটা তিক্ত হয়ে যায়। যার মনের ধারণ ক্ষমতা বেশি সে অনেক কিছু বৈরিতাকে মনের ভিতরে রেখে দিতে পারে, শুধু সৌন্দর্যটুকু বাইরে প্রকাশিত হয়। প্রকৃতির নিয়ম হল গ্রহণ (শোষণ) এবং বিকিরণ। পৃথিবী যতটা তাপ পায় তার সবটাই ছেড়ে দেয় না। কিছুটা তাপ ধারণ করে রাখে, পরে ধীরে ধীরে ছাড়ে। মনের মধ্যেও কিছু অপছন্দের জিনিসকে অন্তরীণ রাখা যায়। ভারতীয় পুরাণে নীলকণ্ঠ বর্ণিত আছে, যে সব গরলকে ধারণ করে রেখেছিল, পৃথিবীকে রক্ষা করেছিল।

প্রসারণ ক্ষমতা কমে গেলে নতুন কিছুকে গ্রহণ করার মানসিকতা একদম হারিয়ে যায়। এভাবেই জেনারেশন গ্যাপ তৈরি হয়, ছোটখাটো বিষয়েও সম্মত তৈরি হয়।

এই প্রসারণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কী করা যেতে পারে? পেশীর ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ব্যায়াম করতে হয়। তেমনি মনের প্রসারণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মনের চর্চা গড়ে তুলতে হবে। কেউ যখন আমাকে কোনো কথা বলল, আমার হয়ত সেটা পছন্দ হল না, তখন আমার ভাবা উচিত ঐ ব্যক্তি কেন আমাকে কথাটা বলল, ওর তরফে যুক্তি কী হতে পারে। ওর যুক্তি হয়ত আমার কাছে ততটা

প্ৰহীণ নয়, কিন্তু আমি যদি কটু ভাবে উত্তর না দিই তাহলে কী আমার কোনো অসুবিধা হবে? যদি অসুবিধা না হয় তাহলে কটু ভাবে না বললে ঐ ব্যক্তি আঘাত পাবে না, অথচ আমার উত্তর দেওয়া হয়ে গেল। অন্যকে আঘাত করব না এই বৈশিষ্ট্য আমাকে অর্জন করতে ই হবে। এতে আমার কোনো ক্ষতি হল না। কিন্তু লাভ হল। লাভ হল যে আমি শত্রু (আমার ড' পর খারাপ ধারণাকারী) বাড়িলাম না। গৌতম বুদ্ধের এক কাহিনী আছে। একদিন রাত্তায় যেতে যেতে এক ব্যক্তি বুদ্ধকে খুব খারাপ কথা বলেই যাচ্ছিল। বুদ্ধ কোন উত্তর দিচ্ছিলেন না। কিছুক্ষণ পরে এক শিষ্য বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি কেন উত্তর দিচ্ছেন না। বুদ্ধ তখন লোকটির কাছে গিয়ে বললেন, আচ্ছা, তোমাকে যদি কেউ কোনো কিছু দেয় অথচ তুমি তা না নাও, তাহলে জিনিসটা কার কাছে থাকবে? লোকটি বলল যার জিনিস তার কাছেই থাকবে। বুদ্ধ বললেন আমাকে বলা তোমার ওপরের কথাগুলো আমি নিচ্ছি না। এবার লোকটি লজ্জিত হল।

যার কথা আমার পছন্দ হল না তাকে দু কথা শুনি দিয়ে আমরা খুব তৃপ্তি অনুভব করি। এই মানসিকতা আসলে আমাদের ক্ষতি করে। এই পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্ব কালের বিচারে অতি নগন্য। এই অস্তিত্বকালে যত বেশি মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধুত্বমূলক রাখা যায় ততই জীবনটা উপভোগ্য হবে। বৈরিতা করা অতি সহজ, মৈত্রী গড়ে তোলা ততটাই কঠিন। কাউকে আঘাত করে 'কী, কেমন দিলাম!' অথবা 'যা বাড়ি দিলাম' ভেবে যে তৃপ্তি অনুভব করি সেটা আসলে জীবনের হিসাবের খাতায় ক্ষতিই করে। নিজের ক্ষুদ্র অহং তৃপ্ত হয়। অহং যদি সাগরের মতন বড় হত তাহলে

অনেক বৈরিতাই মনে লীন হয়ে যেত।

এই কারণেই রেগে যাওয়াটা আসলে নিজের ক্ষতি। রেগে গেলে নিজের শরীরে বেশ কিছু অ্যাড্রিনালিন জাতীয় হরমোন বেড়ে যায় যা শরীরের হার্ট কে চাপ দেয়, প্রেসার বাড়ে। যার উপর রেগে গেলাম তার তো ক্ষতি হল না, ক্ষতি হল আমার। তাই কাউকে আঘাত করে কথা বলা উচিত নয়। এই জিনিস আমরা করি অহংবোধের জন্য। নিজেকে অন্যের চাইতে বড় ভাবি তাই অপরকে তাচ্ছিল্য করে নিজেকে আরও বড় প্রমাণ করতে চাই। বুদ্ধ দেব নীচে মাটিতে বসতে ন, বলতেন আর নীচে পড়ে যাবার ভয় নেই। যাকে তুমি বন্ধু ভাব সে যদি ঠিক কাজ না করে, বারবার ভুলও করে, তাকে সেটা বারবার বলে দেওয়া যেতেই পারে সহজভাবে। ধৈর্য এভাবে গড়ে ওঠে। ধৈর্য হল গঠনমূলক প্রক্রিয়া যা সব সময় মানুষের কল্যাণ করে। বিক্রপ করে, রাগ করে, সব সময় খুঁত ধরে, বকাবকি করে, ধমক দিয়ে কথা না বলেও ধীরে ধীরে শুধরে নেওয়া যায়, মন জয় করা যায়। অপরকে কটু কথা না বলার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। চেষ্টা করলে এই অভ্যাস গড়ে উঠবে। কাউকে কটু কথা অর্থাৎ খারাপভাবে বকা, গালাগালি করা বা নিন্দা করতে মন চাইলে নিজের মনকে নিজেই ধমক দিতে হবে। প্রথম প্রথম সফল না হলেও ধীরে ধীরে সফল হওয়া সম্ভব হবে। একবারে না হলে বারবার প্র্যাকটিস করলে গোলে বল ঢুকবেই। মনের প্রসারতা যাদের কম তারা সহজেই হতাশার শিকার হয়, কারণ সামান্য প্রতিকূলতাকেও এরা হজম করতে পারে না। একটু ব্যতিক্রম হলেই ভাবতে থাকে আবার ঝামেলা হল, উদ্বেগে অক্লান্ত হয়। এরাই তাড়াতাড়ি অবসাদের শিকার হয়। মনের প্রসারন ঘটানো কি সম্ভব?

মনটাকে উদার করতে পারলে তা সহজেই সম্ভব। মনের এই প্রসারন ক্ষমতা চর্চার মাধ্যমে বাড়ে। সেতার বাজানোর নিয়মিত চর্চা রাখলে যেমন বাজানোর ক্ষমতা বাড়ে।

দেহের বার্ধক্য এলেই যে মনের বার্ধক্য আসবে তার কিছু মানে নেই। মনের বার্ধক্য যে কোন বয়সে হতে পারে। দেহের বার্ধক্য মানুষকে ক্রমশঃ কাজকর্মে চলাফেরায় শ্লথ করে দেয়। কিন্তু মনের বার্ধক্য যে কোন বয়সে মানুষকে তিক্ত করে তোলে, মাধুর্যহীন করে দেয়। খুব বয়স্ক মানুষও মনের মাধুরীতে আকর্ষণীয় হয়ে বাঁচতে পারে। তা আমাদের চেষ্টা করা উচিত মনের বার্ধক্যকে যতটা সম্ভব আটকে দেওয়া।

ডা. হৈমবতী সেন

গৌতম রায়চৌধুরী

এই প্রবন্ধের অনায়াসে অন্য শিরোনাম হতে পারত, ‘সাদা থান থেকে সাদা অ্যাপ্রন’ বা ‘বাল্য বিধবা থেকে চিকিৎসক’। হৈমবতী সেই বিরল বাঙালি মহিলাদের মধ্যে একজন, যাঁরা বিশ শতকের শুরুতেই প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করে কী ভাবে দুর্ভাগ্যের বন্ধ চাকটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিতে হয় তা দেখিয়েছেন।

হৈমবতীর জন্ম ১৮৬৬ সালে অবিভক্ত বাংলার খুলনা জেলার ঘোষ পরিবারে, যারা ছিল রাজা প্রতাপাদিত্যের উত্তরসূরি। কিন্তু পরবর্তীকালে জমিদারেরা—মদ্যপান, নাচ-গান-জুয়া, বেশ্যাগমন—ইত্যাদির পক্ষে ক্রমশঃ ডুবে যাচ্ছিলেন। হৈমবতীর বাবা প্রসন্নকুমার ঘোষ মদ্যপানসহ অন্যান্য দোষে দোষী হলেও ছিলেন খুব উদার মনের মানুষ। তাই প্রথম সন্তান, মেয়ে হলেও খুব আদরের ছিল।

হৈমবতীকে আদর করে ডাকতেন ‘চুণীবাবু’ বলে। সেই সময়ে সাধারণত মেয়েদের অক্ষর-শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল কারণ প্রচলিত ধারণা ছিল পড়াশোনা করলে মেয়েরা বিধবা হবে। অথচ হৈমবতী খুব পড়াশোনা ভালোবাসতেন। পাঠশালার আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়া মুখস্থ করে ফেলতেন। বাবার প্রশ্নে তাঁর পড়াশোনা শুরু হয়। প্রসন্নকুমার সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা মানুষ হলেও হৈমবতীর বাল্যবিবাহ আটকাতে পারেন নি। সেই সময় তাঁর বয়স মাত্র সাত। নয় বছর আর বরের বয়স পঁয়তাল্লিশ, উঁচু পরন্তু হৈম তার তিন নম্বর বউ। হৈমর থেকে সামান্য ছোট দুটি মেয়েও আছে তার। মদ্যপ বয়স্ক স্বামীর যৌনকাজক্ষা এক রত্তি হৈম না মেটাতে পারায়, প্রায় প্রতি রাতে তাঁর স্বামী ঘরে গণিকা নিয়ে আসতেন। হৈমবতী স্বচক্ষে দেখতেন গণিকার সঙ্গে স্বামীর রতিক্রীড়া। বিয়ের এক বছরের মধ্যে স্বামী-বেচারিা লিভার ফেটে মারা গেল। বাল্যবিধবাকে স্বশ্রববাড়িতে পরিচরিকার মতো থাকতে হলেও, হৈমবতী পড়াশোনার ইচ্ছাটা ত্যাগ করেন নি। কিন্তু শাস্তিভীর মৃত্যুর পর সম্পত্তির ভাগ পাওয়া তো দূরের কথা, ঠাই পাওয়াই ভার। বাপের বাড়ির ছবিটাও আলোদা কিছু নয়। মা-বাবার অবর্তমানে ভাই বা দেওর কেউই তাঁকে মাথা গোঁজার ঠাইটুকু পর্যন্ত দিল না। ফলে নিঃসম্বল হৈম কাশীবাসী হলেন। অন্যান্য কাশীবাসী বাল্যবিধবাদের সঙ্গে হৈমর একটা তফাৎ ছিল— তাঁর অনমনীয় জেদ এবং পড়াশোনা শেখার অদম্য ইচ্ছা। এদিকে যে কুটুম্ববাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিলেন সেখানেও টেকা গেল না, কারণ দেওর প্রতিশ্রুতিমত টাকা পাঠায় নি এবং দুই জ্ঞাতি বউ মনে করেছিল সুন্দরী বালবিধবা তাদের সংসারে আশ্রয় ধরিয়ে দেবে। ভাগ্যক্রমে হৈমবতী একটা

বাচ্চাদের স্কুলে পড়ানোর চাকরি পেয়ে গেলেন। কাশীতে হৈমর ভালো কাটে নি। কুড়ি-একুশ বয়সের অসহায় সুন্দরী বিধবা, সহজেই কামুকদের নজরে পড়লেন, প্রচুর গুজব রটে গেল। এমন সময়ে খবর পেলেন কলকাতায় বিধবাদের নানান ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। হৈম কাশী ছেড়ে একই কলকাতায় চলে কোনো লোভ নেই, তবে তাঁকে মেডিকেল কলেজে এলেন। হৈমবতী আজীবন আপন-পর ভেদাভেদ না করে সকলের সঙ্গে মিশেছেন। এমনই একজন অনাঙ্কীয় তাঁকে ব্রাহ্ম সমাজের নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী এবং দুর্গামোহন দাসকে একটি সুপারিশপত্র লিখে দিয়েছিলেন। এই সূত্রে ব্রাহ্ম সমাজের তাঁর যোগাযোগ হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী তখন বিলেত চলে গেলেন বলে তাঁকে পূর্ব-বাংলার এক ব্রাহ্ম পরিবারের হাতে সঁপে দিলেন। তদানীন্তন পূর্ব-বাংলায় তাঁকে বিচিত্র ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়। তখন বিধবা বিবাহ চালু হয়েছে। ঢাকা এবং কলকাতার হিতার্থীরা সবাই তাকে উদ্দেশ্য দিল যে এই সমাজে টিকতে হলে বিয়ে করতে হবে এবং বিয়ে করলেই তাঁর পক্ষে পড়াশোনা করা সম্ভব হবে। তেইশ বছর বয়সে ফের হৈমর বিয়ে হল ব্রাহ্ম কুঞ্জবিহারী সেনের সঙ্গে; যার নিজস্ব কোনো রোজগার ছিল না।

বিয়ের পরই হৈম আবার পড়াশোনার অনুমতি পেলেন। ১৮৮৮ সালে কলকাতার ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে ছাত্রী নেওয়া শুরু হল। ১৮৯১ সালে হৈমবতী ছাব্বিশ বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে ক্যাম্পবেল স্কুলে ভর্তি হলেন। পরীক্ষায় ভালো ফল করতে লাগলেন। বৃত্তি পেতে শুরু করলেন। সংসারের কিছুটা সুরাহা হল, কারণ স্বামী কোনোদিন কিছু রোজগার করেন নি। বাড়ির সব কাজ হৈমকেই করতে হত। পরীক্ষায় ভালো ফল

করার জন্য পুরুষ সহপাঠীরা তাকে হিংসা করত। সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার জন্য যখন তাঁকে স্বর্ণপদক দেওয়ার ব্যবস্থা হল, সেই সহপাঠীরা বাধা দিল। কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে তাঁকে আলোচনায় ডাকলেন, সেখানে হৈমবতী জানাল তাঁর সোনার মেডেলে লেকচার শোনার অনুমতি দিতে হবে।

ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ করলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ডিগ্রি না থাকায় তাঁকে এলএমএস ডিপ্লোমা দেওয়া হয় নি। অনেকেই তাঁকে ডাক্তারের মর্যাদা দেয় নি, তাঁদের ভাষায় তিনি ছিলেন শিক্ষণপ্রাপ্ত দাই। হৈমবতী এসবে কণপাত করেন নি। ১৮৯৪ সালে তিনি হুগলীর ইমামবাড়া হাসপাতালে চল্লিশ টাকা মাস মাইনেতে যোগ দিলেন। হৈমবতী যোগ দেওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই হাসপাতালের সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। জেলার একমাত্র মহিলা ডাক্তার হৈম হাসপাতালে এবং নিজের ক্লিনিকে হাজার হাজার রোগীর চিকিৎসা করতেন। তাঁর হাসপাতালের নামকরণ কলকাতার ভিক্টোরিয়া জেনানা হাসপাতালকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। ১৮৯৭ সাল থেকে তিনি ছোটোখাটো অপারেশন করা শুরু করলেন— পরে অবশ্য কিছু বড় অপারেশনও করেছিলেন। যে হাসপাতালের জন্য তিনি প্রাণপাত করেছিলেন, সেই হাসপাতাল থেকে ১৯১০ সালে হৈমকে অজ্ঞাত কারণে ইস্তফা দিতে হয়।

হৈমবতীর বিবাহিত জীবন সুখের হয় নি। নিজের পেশার প্রবল চাপ সামলে তাকে বৃহৎ সাসার (স্বামী, চার ছেলে ও এক মেয়ে) এক হাতে চালাতে হত। স্বামী ধর্মপ্রচার নিতে ই ব্যস্ত থাকতেন। কোনোদিন অর্থ উপার্জন বা সংসারের কোনো কাজ করেন নি। উপরন্তু ‘কর্তা’ হওয়ার

সুবাদে নির্বিকার চিত্তে হৈমর ডি পার্জিত অর্থ আত্মসাৎ করতেন।

১৯০২ সালে হৈম দ্বিতীয়বার বিধবা হন।

তখনও তাঁর বিশাল পরিবার — নিজেপারেন নি। কিন্তু এই ২০২১ সালেও মেয়েরা কী ছেলে-মেয়ে, পালিত মেয়ে, তাদের ছেলেমেয়েরা; তাঁর বেকার ছেলে ও তাঁর পরিবার, তাঁর ছোট বোন ও বোনের বেকার স্বামী, এছাড়া স্বশ্রুতবাড়ির দিকের বহু আত্মীয়স্বজন। শেষ বয়েসে তিনি চোখে দেখতে পেতেন না। ১৯৩০ সালে স্তন ক্যানসারে হৈমর মৃত্যু হয়।

হৈমবতী নিজেকে শুধুমাত্র চিকিৎসকের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করতেন। ছোটগল্প, কবিতা ছাড়া তাঁর আত্মজীবনী ‘আত্মকথা’ এক অসাধারণ রচনা, ২০০০ সালে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ তপন রায় চৌধুরী ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। পরে একাধিক বাংলা অনুবাদ হয়। তাঁর আত্মকথা যেন এক রুদ্ধশ্বাস উপন্যাস। উনিশ শতকে বেশ কয়েকজন নারীর আত্মকথা প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু হৈমর আত্মকথা তাঁদের সকলের থেকে স্বতন্ত্র। তাঁর লেখায় তৎকালীন বাঙালি হিন্দু পরিবারের নারীদের আর্থিক শোষণ, পুরুষতন্ত্রের দাপট, যৌন নিপীড়নের বিবরণ, পুরুষ সহকর্মীদের ঈর্ষা সব আছে। তাঁর লেখায় স্বামী এক পূজনীয়, দয়ালু, দ্বীর সর্বকর্মে উৎসাহদাতা, সংবেদনশীল পুরুষ নন।

তিনি এক অত্যাচারী পুরুষের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। শুধু স্বামী (প্রথম/দ্বিতীয় উভয়ই) নয় সমগ্র পুরুষতন্ত্রের নির্মমতাকে অঙ্কিত করেছেন। শুধু বিক্রপ নয়, তাঁর ব্যর্থতাও তাঁর আত্মকথায় ফুটে উঠেছে।

হৈমবতী নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছিলেন, বিধবা হওয়ার পর আবার বিয়ে

করেছিলেন এবং স্বমর্যাদায় নিজের পেশায় নিয়োজিত ছিলেন তবু পিতৃতান্ত্রিক পরিবারতন্ত্রের বেড়া ভাঙতে পারেন নি। হয়তো বিশ শতক বলেই সেই বেড়া ভাঙতে পারছেন?

তথ্যস্রাণ : ডা. হৈমবতী সেন - এর জীবনকথা - প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্য সংসদ, ২০১৯।

কোভিড-১৯ মহামারি ও অভিজ্ঞতা

তপন কুমার দাস

অভিজ্ঞতা মানুষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। কোনো মানুষই বা রাষ্ট্র অভিজ্ঞতা ছাড়া এক ধাপও এগোতে পারে না। রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য জনগণ। আর এই জনগণই রাষ্ট্রের প্রধান বিচার শক্তির নির্ধারক। বাংলাদেশ বইমেলা থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি আখাউরা বর্ডার দিয়ে ত্রিপুরা প্রবেশ করছি সেই সময় জ্বর মাপার এক বিশেষ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করে নিচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। তখন ঐ বিষয়টি তেমন গুরুত্ব অনুভব করিনি। তখন বইমেলা নিয়ে ব্যস্ত। ত্রিপুরায় বইমেলা শেষ করে যখন ১৩ মার্চ কলকাতায় ফিরছি—ঠিক তখনই দমদম এয়ারপোর্টে স্বাস্থ্যকর্মীরা জ্বর আছে কিনা যন্ত্রের সাহায্যে মাপে নিচ্ছেন। তখন বুঝিনি এর গুরুত্ব ও তার ভবিষ্যৎ।

গত জানুয়ারি মাস থেকে বিশ্বের এক নতুন রোগের আবির্ভাব হয়েছে। ভারত বর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গেও এর প্রভাব পড়েছে। মোদীজির ঘণ্টা বাজানোর পর আমরা বিষয়টিকে নিয়ে গুরুত্ব অনুভব করলাম। এই অজানা রোগের চিকিৎসা আমাদের কাছে অজ্ঞাত। পত্রিকা এবং বিশিষ্ট চিকিৎসকদের দূরদর্শনের মাধ্যমে পরামর্শই আমাদের শিক্ষা। সেইভাবেই আমরা যথাযথভাবে

চলার চেষ্টা করছি। সাধারণভাবে আমাদের কাছে সে পরামর্শ চিকিৎসকরা দিচ্ছেন তা আমরা পালন করছি না। ফলে ছ ছ করে বাড়ছে কোভিড - ১৯ এর রোগীর সংখ্যা। যা আজ পশ্চিমবঙ্গে মহামারির রূপ ধারণ করেছে। গত ৩১ আগস্ট মাসে আমি নিজেই কোভিড - ১৯ এর রোগী হয়ে ছিলাম। জ্বর, কাশি এবং শ্বাসকষ্ট নিয়ে বালিগঞ্জের 'অল এশিয়া নার্সিংহোমে' ভর্তি করানো হল আমাকে। মাত্র দুদিন সেখানে ছিলাম। না চিকিৎসা, না নার্সদের পরিষেবা, চিকিৎসকদের দেখভাল কিছুই ছিল না। এমত অবস্থায় আমার পরিবার বন্ড দিয়ে আমাকে নিয়ে আসে। আর মজার ব্যাপার, নামমাত্র ভাবে কোরোনার পরীক্ষা করে জানায় নেগেটিভ। ছুটির সময় ঐ দুদিনের বিল দাঁড়ায় ৮৭, ৭০০ টাকা। কেন এই বিলের পরিসংখ্যান আজও আমাদের কাছে অজানা।

অর্থাৎ কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ। বাই পাশ এর ধারের হাসপাতালগুলির ১২ দিন কিংবা ১৪ দিনের বিলের পরিমাণ ১৪ থেকে ১৭ লক্ষ টাকা। যা মধ্যবিত্তদের ধরাছে যার বাইরে। বহু প্রশ্নের সম্মুখীন আমরা। সরকারের কাছে প্রশ্ন করলে দায়সারা উত্তর দিয়ে এড়িয়ে যাচ্ছে।

২ সেপ্টেম্বর গড়িয়ার রেমেডি হাসপাতালে আমাকে ভর্তি করে দেওয়ার পর যে চিকিৎসা আমি পাই তা এক কথায় অভূত পূর্ব। আমার চিকিৎসক, অনিন্দ্য সেনগুপ্ত, প্রতি দিন যেভাবে চিকিৎসা দিয়েছেন তা অতুলনীয়। তাঁর তদারকি এবং বন্ধুসুলভ ব্যবহার যে কোন রোগীকে সুস্থ করার পক্ষে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। প্রতি দিন চিকিৎসক নিয়ম করে রোগীর সঙ্গে দূরাভাষ মারফৎ কথা বলে সব সমস্যা জেনে নিতেন। ওষুধের থেকে

বেশী কাজ করত এই সাক্ষাৎ। যে কোনো হাসপাতালে একবার ভর্তি হলে বাড়ির পরিবার কিছুই জানতে পারে না। সে ক্ষেত্রে রোগী অসহায়, বাড়ির পরিবারও অসহায়। সরকারী হাসপাতালের এই ব্যবস্থা পনা এতই নিম্ন মানের যে বলার অপেক্ষা রাখে না। একজন রোগী মারা গেছেন আর অন্য রোগীর পরিবারকে বলা হচ্ছে, তিনি বেঁচে নেই। শ্রাদ্ধের পরে জানা যাচ্ছে তার বাবা বেঁচে আছে। এর থেকে আর কী দুঃখের হতে পারে।

অথচ গড়িয়ার রেনেডি হাসপাতালে নিয়ম করে প্রতি সন্ধ্যায় ভিডিওর মাধ্যমে রোগীর সঙ্গে পরিবারের সাক্ষাৎের ব্যবস্থা করে দিত। ফলে উভয়ের মধ্যে মনের প্রশান্তি ঘটত। সেখানকার নার্স এবং অন্যান্য কর্মীদের পরিষেবা যা প্রতি নিয়িত রোগীকে অনেক উন্নত মানের রোগ নিরাময় করতে সাহায্য করেছে। কখনও কখনও মনে হয়েছে এটা হাসপাতাল নয় যেন বাড়ি। সেখানকার কর্ণধারকে সবাই "মেজদা" বলেন। তিনি রোজ সকালে এসে রোগীদের সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ করতেন এবং কত তাড়াতাড়ি আমরা বাড়ি আসতে পারি রোগমুক্ত হয়ে তার জন্য কামনা করতেন। যা আমাদের কাছে ঐ কঠিন অবস্থায় যেন আশীর্বাদ বাণী বলে মনে হত।

এই সকল ঘটনা উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, অভিজ্ঞতা, ভালোবাসা, পরিবেশ এবং পরিষেবা হওয়া উচিত সে কাজটাই চিকিৎসক, নার্স এবং অন্যান্য কর্মী বন্ধুরা করেছেন যা আগামী দিনে চলার পথে দিশা। এই কঠিন সময়েও যে নতুন আলো আছে — তা বিকশিত হোক নতুন বছরে।

—: বিজ্ঞপ্তি :—

ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিক

জয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ ভবন
৯০/১, পি. জি. এইচ শাহ রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৯৫

যোগাযোগ - ০৩৩-২৪৭৩ ৯৬৪২ /
৯৬৭৪৫৫৩৪৭৭ / ৯৪৩৩৭৯৭০৫৮

সুলভে আধুনিক ফিজিওথেরাপী -

ছুটির দিন ব্যতীত সপ্তাহের
প্রতিদিন - সকাল ১০.৩০ থেকে সন্ধ্যা ৭টা।

- ডাক্তার চেম্বার -

অ্যালোপ্যাথি / হোমিওপ্যাথি,
আকুপাচার

অর্থোপেডিক : মঙ্গলবার -সন্ধ্যা ৬টা
: শনিবার -বেলা ১টা
হোমিওপ্যাথ : বুধবার -বিকাল ৫টা
: শুক্রবার -বিকাল ৪টা
: শনিবার -বেলা ১২টা

—: বিজ্ঞপ্তি :—

সদস্য/সদস্যা ও তাদের নিকট বর্তী
আপনজনদের জন্মদিন, অন্নপ্রাশন,
উপনয়ন, বিবাহ - বার্ষিকী প্রভৃতি বিষয়
সামান্য খরচে প্রবীণবার্তায় ছাপানো যেতে
পারে। বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন।

- বিজ্ঞাপন -

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় ৭৬ বছর

পিপলস রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)
২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরভাষ : ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪
যাদবপুর কেন্দ্র

বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন

৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড,
যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২
বাস স্টপ : অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে
দূরভাষ - ২৪২৫ ৪৪৫৪ (সন্ধ্যা ৬-৭টা)

কম খরচে

রোগনির্ণয়ে রক্ত পরীক্ষা

সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮টা-১১টা)

স্পেশালিষ্ট ক্লিনিক

পরামর্শ ১০০ টাকা + পি. আর. সি. সহায়তা
১০ টাকা

১) ডঃ উৎপল ব্যানার্জী (অর্থোপেডিক)

এম.এস, ডি.এন.বি (অর্থো)

প্রতি মাসের ২য়/৪র্থ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা-৭টা

২) ডঃ প্রদ্যুৎ শূর এম.ডি. (গাইনোকলজিস্ট)

বুধবার, সন্ধ্যা ৭টা-৯টা

৩) ডঃ বি. বাড়ীর - এম.ডি. (জেনারেল

মেডিসিন)-বুধবার, ৩টা-৪টা

৪) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জী এম. ডি. (নিউরো-

সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) মঙ্গলবার, ৮টা-৯টা

৫) ডঃ মৌমিতা চ্যাটার্জী এম.ডি. (জেনারেল

অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন), সোমবার, সন্ধ্যা ৮টা-৯টা

আবেদন _____

বিধান পদ্ধিতে নির্মিয়মান বৃদ্ধাবাসের জন্য অর্থ
সাহায্য করুন।